জ্ঞানের পথে চলার বাঁকে

জ্ঞানের আদব, চোরাফাঁদ, সমালোচনার আদব

বাক্‌র আবু জাইদ
সালমান আওদা
ইবনু রাজাব হানবালি

ভাষান্তর
মাসুদ শরীফ
শেখ আসিফ

নিনাদ প্রকাশ

জ্ঞানের আদব

৭৩

জ্ঞানের চোরাফাঁদ

সমালোচনার আদব

শুরুর কথা

সব তারিফ আল্লাহর।

বইটি লিখেছিলাম ১৪০৮ হিজরি সনে (১৯৮৮ সাল)। জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে তখন নতুন এক গাছ বড় হচ্ছিল ধীরে ধীরে। শক্ত কাণ্ড নিয়ে উম্মাহর তরুণদের মাঝে মেলছিল ডালপালা। এই জ্ঞানই তো দীপ্তিময় করে মানুষের মুখাবয়ব। মরচে পড়া জীবনে দেয় মহিমা, করে প্রখর উজ্জ্বল।

আজ একের পর এক জ্ঞানের তরুণ তুর্কিরা উঠে আসছে আমাদের সামনে। জ্ঞানের নানা আঙিনায় তাদের কলরব। কী প্রকাণ্ড ভার জ্ঞানের, অথচ তবু তারা পথ চলছে অবিরত। এ-পথে লেগে থাকার মাঝে কী বিস্ময়কর আকাঙ্ক্ষা তাদের। অসামান্য যোগ্যতা আর মাটি কামড়ানো ধৈর্য নিয়ে তারা আগুয়ান। মুসলিমদের আসন্ন বিজয়ের এক আগাম আভাষ এটা। অন্তরগুলোকে যিনি জাগান, যিনি হরণ করেন, তাঁর তরেই সব তারিফ।

জ্ঞানের এই পথে নানা চোরাখাদ। অসতর্কে যেকোনো সময়ে তাতে পড়ে যাওয়ার শঙ্কা। আছে বুদ্ধিবৃত্তিক ভাবাদর্শিক চ্যালেঞ্জ। বিরোধিতার কাটা, কিংবা দলীয় চিন্তাভাবনার কালোথাবায় আক্রান্ত হবার ঝুঁকি। জ্ঞানের চারাটিকে এসব কীট বাড়তে দিতে চায় না। এসব থেকে বাঁচার জন্য দরকার পরিচর্যা, যত্ন।

নিজেদের জ্ঞানী বলে ভান ধরে, এমন ছুপাছাত্রদের ব্যাপারে হুঁশিয়ার করে জ্ঞানের অভিযাত্রীদের কাছে এক ছোট বই লিখেছিলাম। আমার শঙ্কা ছিল, এরা সাধারণ ছাত্রদের ক্ষতি করবে, বিভ্রান্ত করবে, কিংবা হয়তো এই পথে থেকেই সরিয়ে দেবে। বড় করে সেসব বিষয়ই লিখে যাচ্ছি

এ-বইতে। আশা করছি, আল্লাহর তরফ থেকে তোমাদের মনে শান্তি আনার জন্য এটা যথেষ্ট হবে।

আমাদের ধর্ম বলে নিজেকে শ্রেষ্ঠ আদবে সাজাতে। নিজেকে ভালো ভালো আচরণ দিয়ে মোড়াতে। এগুলো একজন ধার্মিক ব্যক্তির অনন্য গুণ। আদবহীন মানুষের পক্ষে, আর যা-ই হোক, ইসলামের জ্ঞানরত্ন হাসিল সম্ভব না। এজন্য কত যে মনীষী আদবকেতা বিষয়ে বই লিখে গেছেন—কেউ কেউ লিখেছেন নির্দিষ্ট কোনো জ্ঞানরত্ন কুড়োতে কী আদব লাগে, সেই বিষয়ে। কেউ লিখেছেন সামগ্রিকভাবে জ্ঞান অর্জনের বিষয়টি নিয়ে। আমার বইটি সাধারণভাবে একজন জ্ঞান অর্জনকারীর কী কী আদব বজায় রাখা উচিত সে-বিষয়ে।

একটা সময় জ্ঞান অর্জনের রীতি ছিল অন্যরকম। বহু জায়গা থেকে ছাত্ররা এসে জড়ো হত নির্দিষ্ট এক জায়গায়। আমাদের বড় বড় জ্ঞানীরা সেখানে এসে জ্ঞান বিলাতেন। শেখাতেন জ্ঞান অর্জনের আদব। মাসজিদুন-নাবাউইর এরকম এক জ্ঞান মাজলিসে জড়ো হতাম আমি। সেখানেই উস্তাজদের কাছ থেকে শিখি মনীষী জারনুজির তা‘লিমুল-মুতা‘আল্লিম তারিকুত-তা‘লিম (জ্ঞানপিপাসুকে জ্ঞানার্জনের পথ দেখানো) নামের বিখ্যাত বইটি। আমার একটা ইচ্ছে, আদবের বিষয়টি আমাদের সম্মানিত জ্ঞানীগুণিজনেরা যেন মাসজিদ-ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা এবং স্কুল-কলেজ-মাদরাসার পাঠ্যসূচিতে বাধ্যতামূলক করেন। আমার আশা, জ্ঞান অর্জনের আদবের পালে আমার এ-বইটি নতুন হাওয়া দেবে। ছাত্র-ছাত্রীদের শুধু নিয়মানুবর্তিতার পাঠ দেবে না; দেবে সেগুলো অনুসরণের প্রণোদনা—নিজের থেকে শুরু করে নিজের শিক্ষক, সহপাঠী, এমনকী বইপত্রের বেলাতেও আদব মেনে চলতে উৎসাহ দেবে তাকে। জীবনের পরবর্তী পর্যায়েও আদব ধরে রাখতে তাকে সাহায্য করবে।

এ-বইতে আমি যেসব আদবকেতা তুলে ধরছি, সেগুলো এড়িয়ে চলাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তাতে শুধু নিজের খারাপ বৈশিষ্ট্যই

বাড়বে। আদবকেতাগুলোর কিছু কিছু পালন করলে ভালো, কিছু কিছু আছে পালন না করলেই নয়। কিছু কিছু কাজ অপছন্দের, কিছু কিছু কাজ করা একেবারে অনুচিত। কিছু কিছু আদবলেহাজ সবার জন্য, কিছু শুধু জ্ঞানের অভিযাত্রীদের জন্য। কিছু ছেলেদের জন্য বিশেষ, কিছু মেয়েদের জন্য। এগুলোর কিছু কিছু আমরা কুরআন-হাদিস থেকে এমনিতে জানি। কিছু আমরা শিখি নিজেদের কাণ্ডজ্ঞান দিয়ে। তবে কুরআন-হাদিসে এগুলোর ব্যাপারে সাধারণ দিকনির্দেশ পাওয়া যায়।

ছোট্ট এই বইতে যে সব আদবকেতা তুলে ধরেছি, তা বলব না। তবে একটা সামগ্রিক বিন্যাস তুলে ধরেছি, যাতে মোটামুটি একটা ধারণা তৈরি হয়ে যায়। নিজে থেকে যেন বোঝা যায় কোন আদবটাকে বেশি প্রাধান্য দিতে হবে, আশা করি বইটা পড়ে সেটা বোঝা যাবে। ভবিষ্যত-জীবনে এ-আদবগুলোকে আরও ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করে কল্যাণ নিয়ে আসা যাবে নিজের জীবনে।

যেসব মহান মহান মনীষীদের জ্ঞানে আল্লাহ বারাকা দিয়েছিলেন, বানিয়েছিলেন মুসলিম জাতির ইমাম, তাঁদের জীবন থেকে নেয়া হয়েছে এসব আদবকেতাগুলো। তাঁরা আমাদের জ্ঞানযাত্রার আদর্শ। আল্লাহ তাঁদের সবার সাথে জান্নাতে আমাদের একত্রিত করুন। আমিন।

বাক্‌র বিন আবদুল্লাহ আবু জাইদ
মার্চ ২৪, ১৯৮৮

কিছু আদব নিজের সাথে

জ্ঞান অর্জন এক ইবাদাত।[০০১] কোনো কোনো মনীষী বলেছেন, "জ্ঞান অর্জন মনের সালাত, হৃদয়ের ইবাদাত।"

আর সেজন্য অন্যান্য ইবাদাতের মতো, একাজটিও আমাদের করতে হবে একান্ত আল্লাহর জন্য। আমাদের প্রিয়নবি মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন, «প্রত্যেক কাজের ফল নিয়তের উপর...।»

আমাদের জ্ঞান অর্জনে যদি এই আন্তরিকতার অভাব থাকে, তা হলে এরচে নিকৃষ্ট কিছু আর হবে না আমাদের জন্য। লোক-দেখানো বা লোকের বাহবা কুড়ানোর জন্য হলে এর থেকে পুরো বারাকা বা কল্যাণ হারিয়ে যাবে। একজন মুসলিমের জন্য রিয়া বা লোক-দেখানো ইবাদাতের চেয়ে মারাত্মক আর কিছু নেই।

এরকম আরেকটি জঘন্য খাসলত হল, মানুষের মুখে নিজের নাম ছড়াবে—এ-উদ্দেশ্যে জ্ঞান তালাশ। এরকম লোকেরা মানুষকে শোনানোর জন্য বলে, "জানো, আমি অমুক-তমুক জিনিস জানি, আমি অমুক-তমুক জিনিস মুখস্থ করেছি..." ইত্যাদি।

আমাদের জ্ঞানযাত্রাকে যেসব খাসলত কলুষিত করে, সেগুলো থেকে দূরে থাকার কোনো বিকল্প নেই। যেসব খাসলত জ্ঞান অর্জনের মতো মহৎ কাজটিকে নস্যাৎ করে তার মধ্যে আছে, নিজেকে সবার কিংবা সতীর্থদের থেকে আলাদা করে যেন চেনা যায়, সে-চিন্তা;[০০২] নিজের স্বার্থে সতীর্থদের ব্যবহার; খ্যাতি, টাকাপয়সা, লোকের তারিফ, নিজের অনুসারী বাড়ানো—এমন মতলব থাকা ইত্যাদি। এসব কাজ আমাদের জ্ঞান অর্জনের যে-কল্যাণ তা নষ্ট করে দেয়। কাজেই খেয়াল রাখত হবে, আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোনো নিয়তে যেন জ্ঞান অর্জন না হয়। যেসব কাজকারবার

আমাদের মনের মাঝে এসব বদমতলব জাগাতে পারে, সেগুলো থেকেও দূরে থাকতে হবে।

জ্ঞান অর্জনকারীরা অনেক সময় নাম কামানোর জন্য বেশিরভাগ সময়ে বিতর্কিত বিষয় নিয়ে মেতে থাকে। যেন তাদের প্রধান কাজ আলিমদের ভুল ভাইরাল করা।[০০৩] বিখ্যাত তাবি সুফিয়ান সাওরি / বলেছেন, "একসময় আমি কুরআন খুব ভালো বুঝতাম। কিন্তু যখন এ-দিয়ে আমার আয়রোজগার বাড়ল, তখন আমার সে-জ্ঞান লোপ পেল।"[০০৪]

আমাদের চরিত্রের এসব খাসলত থেকে মুক্তি পেতে নিজেকে সৎ হতে হবে। নিজেকে আন্তরিক হতে হবে। হুঁশিয়ার থাকতে হবে যেসব চিন্তাভাবনা নিজের আন্তরিকতাকে বরবাদ করে দেয়, সেগুলোর সম্বন্ধে। আল্লাহর কাছে নিজের এই দুর্বলতাকে তুলে ধরে আন্তরিকভাবে ফিরতে হবে তাঁর পানে। সুফিয়ান সাওরি / বলেছেন, "আমার সততাকে আমি সবচে আগলে রাখি।"

উমার বিন জার একবার তাঁর বাবাকে বিলেছিলেন, "আচ্ছা বাবা, আপনি খুৎবা দিলে সবার চোখ কেমন পানিতে ছলছল করে; কিন্তু অন্যদের খুৎবায় এমন হয় না কেন?"

তাঁর বাবা বললেন, "যে-নারী আসলেই শোকে ব্যাথাতুর, আর যে-নারীকে চোখের পানি ঝরানোর জন্য ভাড়া করা হয়, তাদের দুজনের কান্না কি এক হবে?[০০৫]

জ্ঞান অর্জন যেহেতু ইবাদাত-তুল্য, কাজেই এ-কাজটি ঠিকঠাকমতো করতে হলে অনুসরণ করতে হবে নবিজির সুন্না। আল্লাহ বলেছেন, ﴾তোমরা যদি সত্যিই আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমায় অনুসরণ করো। তা হলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন। তোমাদের রাশি রাশি অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ যে বারবার ক্ষমা করেন, দয়ার সাগর।﴿ [৩:৩১]

সাধারণ পোশাকের তুলনায় রাজমুকুটের যে-মূল্য, অন্য যেকারও আদর্শ বা রীতির তুলনায় নবিজির সুন্না তেমন।

জ্ঞানযাত্রার অভিযাত্রী এবং আমার নিজের জন্য সবচে মূল্যবান পরামর্শঃ আমরা যেন গোপনে-প্রকাশ্যে সবসময় আল্লাহকে ভয় করি। এটা আমাদের সব গুণের বীজ। যেকোনো উৎকর্ষ, শক্তি কিংবা উচ্চাকাঙ্ক্ষা মাপার মানদণ্ড এটা। যাবতীয় প্ররোচনা-প্রলোভন থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার নিরাপদ কুঠি। আমরা যেন এটাকে অতি পরিচিত ভেবে হেলা না করি।

অতীতের ধার্মিক ব্যক্তিদের অনুসরণ

জ্ঞানযাত্রা ধর্মচর্চায় আমাদের অনুসরণ করতে হবে অতীতের ধার্মিক ব্যক্তিদের পথ। আর এদের মাঝে সবার আগে নবি ﷺ ও তাঁর সাহাবিরা (আল্লাহ তাঁদের সবার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন)। আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস থেকে শুরু করে ইবাদাত ও অন্যান্য কাজে পরবর্তী সময়ে যারাই তাদের অনুসরণ করেছেন, তাদের অনুগামী হতে হবে আমাদের।

নবিজির সুন্না অনুসরণে আমাদের হতে হবে অনন্য। বিতর্ক উসকে দেয়, কিংবা সন্দেহজনক কথাবার্তা ছাড়তে হবে। দার্শনিক যুক্তিতর্কে জড়ানো যাবে না। যেসব কাজ পাপের দিকে টেনে নেয়, শারিআ থেকে দূরে ঠেলে দেয় সেগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে। ইমাম দারাকুতনি / বলেছেন, "দার্শনিক যুক্তিতর্ক আমার সবচে অপছন্দের।"

ইমাম জাহাবি / বলেছেন, "অতীতের ধার্মিক ব্যক্তিদের যারা অনুসরণ করেন, তারা দার্শনিক যুক্তিতর্কে জড়ান না।" [০০৬]

আসলেই যারা আল্লাহর রাসুলের পথ অনুসরণ করেন, সত্যি বলতে এরাই আহলুস-সুন্না ওয়াল জামাআ। এদের প্রশংসায় ইবনু তাইমিয়্যা / বলেছেন, "সুন্না অনুসারীরা সেরা মুসলিম। মানুষের সাথে তারা উত্তম।" [০০৭]

সুতরাং, আসুন আমরা অতীতের ধার্মিকদের অনুসারী হই। কারণ, অন্যপথগুলো ﴾তোমাদের তাঁর পথ থেকে ফেলে দেবে।﴿ [৬:১৫৩]

আল্লাহর ভয়

আল্লাহর ভয় দিয়ে সাজাতে হবে নিজের বাইরের রূপটাকে, ভেতরের খোলসটাকে। সব জায়গায় থাকতে সুন্নার ছাপ। একদিকে নিজে এগুলো চর্চা করতে হবে, অন্যদিক ছড়িয়ে দিতে হবে মানুষের মাঝে। আল্লাহর পথ পারি দিতে হবে জ্ঞানচর্চা, সুন্দর আচার-আচরণ ও কাজকর্ম দিয়ে। ছেলেদের মাঝে থাকতে হবে পুরুষালী ভাবগাম্ভীর্য আর তেজ। ছেলেমেয়ে উভয়ের মাঝে থাকতে হবে উদার-দয়ালু মনোভাব। গায়ে চড়াতে হবে ধর্মনিষ্ঠার বসন। আর এগুলোর সবকিছুর মূলে আল্লাহভীতি। ইমাম আহমাদ / বলেছেন, "আল্লাহভীতি জ্ঞানের বুনিয়াদ।"

তো, এজন্য সব সময়ে মনে তাঁর চিন্তা, তাঁর ভয় সজীব রাখতে হবে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুসলিম সন্তানেরা আল্লাহকে ভয় করে। আর সত্যি বলতে জ্ঞানীরা ছাড়া আর কেউ আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করে না। তার মানে জ্ঞানীরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুসলিম।

কোনো জ্ঞানী মানুষের চলাফেরা কাজেকর্মে যদি জ্ঞানের প্রতিবিম্ব না পাওয়া যায়, সে আসলে খাঁটি জ্ঞানী নয়। সেই বিম্ব তখনই পাওয়া যাবে, যখন জ্ঞান অর্জনের শেকড়ে থাকবে আল্লাহভীতি।

আলি Ô বলেছেন, "জ্ঞানের প্রয়োগ জ্ঞানার্জনের দাবি। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি হয় সে-দাবি পূরণ করে, নচেৎ তা হারিয়ে যায়।" [০০৮] সুফিয়ান সাওরিও এমন কথা বলেছেন।

যেকোনো অবস্থায় আল্লাহর আনুগত্য

নিজের মন-মনন শরীরকে সবসময় আল্লাহর অনুগামী রাখতে হবে। তাঁকে ভয় করতে হবে বটে; কিন্তু তাই বলে হতাশ হওয়া যাবে না; আশা রাখতে হবে। ভয় ও আশা একজন মুসলিমের দুই ডানা।

নিজেকে পুরোপুরি আল্লাহর তরে নিবেদিত করে এগিয়ে যেতে হবে তাঁর পানে। হৃদয় পূর্ণ থাকতে হবে তাঁর ভালোবাসায়। অনুক্ষণ নিজেকে মশগুল রাখতে হবে তাঁর স্মরণে। তাঁর বিধিমালা আর নিষেধাজ্ঞা খুশি মনে মেনে নিতে হবে। এসব ব্যাপারে চাই তাঁর প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতায় থাকতে হবে নিখাদ আস্থা।

মাটিতে পা

জ্ঞানের মহিমাকে ভাস্বর করতে নিজেকে সংযত হতে হবে। সত্যের সামনে মাথা নত করার মানসিকতা লালন করতে হবে। যেসব নিন্দনীয় খাসল আমাদের এসব সদ্‌গুণকে নষ্ট করে দিতে পারে, সাবধান থাকতে হবে সেগুলোর ব্যাপারে। তা না হলে বুঝতে হবে নিজের ভেতরে গলদ আছে। আর সেটা নিজের চেয়ে ভালো আর কে জানবে!

জ্ঞানযাত্রায় নিজের বাজে খাসলতগুলো না বদলালে জ্ঞানের কল্যাণ পাওয়া দুষ্কর। ঠিকভাবে জ্ঞানচর্চাও হয় না তখন। নিজেকে সেজন্য মাটির মানুষের মতো থাকতে হবে। কারণ, বড়াই করা ভণ্ড আর দেমাগি লোকদের টিকি। আমাদের অতীত ধার্মিক ব্যক্তিরা খুব সাবধান থাকতেন এসব বিষয়ে।

বিখ্যাত জ্ঞানতাপস আম্‌র বিন আসওয়াদ আনসারি সম্বন্ধে ইমাম জাহাবি লিখেছেন,

> "...মাসজিদ থেকে বের হবার সময় তিনি বাম হাতটা ডান হাতের ভেতরে পুরে রাখতেন। একদিন তাঁকে কেউ একজন এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, 'পাছে আমার হাত কোনো ভণ্ডামির ইশারা করে এই ভয়ে।' তবে আমার (জাহাবি) মতে, হাঁটাচলায় হাতের নড়াচাড়ায় অহংকারের কোনো ভাব প্রকাশ পায়, এই ভয়ে তিনি এভাবে এক হাতের মুঠোয় আরেক হাত রেখে চলতেন।" [০০৯]

আনসারির বেলায় ব্যাপারটা অবচেতনভাবেই হত।

খেয়াল করলে দেখবেন, অত্যাচারী শাসকেরা বড় অহংকারী স্বভাবের। নিজেকে এ-থেকে দূরে রাখবেন। অহংকার লোভ আর হিংসা—এই তিনটি খাসলতের কারণে প্রথম আল্লাহর আদেশ অমান্য করেছিল ইবলিস।[০১০]

শিক্ষকের উপরে বড়াই করা অহংকারী আচরণ। নিজের চেয়ে কম জ্ঞানী কারও জ্ঞানে উপকার পেয়ে তার সাথে যদি উদ্ধত আচরণ করি, তবে সেটা দেমাগি আচরণ। এগুলো নিজেকে জ্ঞানের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবার দরজা খুলে দেয়ঃ

যৌবনোদ্ধতার সাথে করে যুদ্ধ জ্ঞান
সুউচ্চ আধারে যেমন আঘাত হানে বান

সুতরাং, আসুন মাটিতে পা রাখি। অন্যের প্রতি দরদি হই। নিজের দেমাগি ভাব দূর করি। আমাদের গর্ব যখন দাম্ভিকতা ধৃষ্টতা আর অন্যের নজরে পড়ার কামনায় রূপ নেবে, তখনই লাগাম আঁটতে হবে। যেসব বদস্বভাব জ্ঞানের কল্যাণকে ময়লা করে, জ্ঞানের মর্যাদাকা খাটো করে, জ্ঞানের আলোতে অন্ধকার ছায়া ফেলে, নিজেকে সেগুলো থেকেও রাখতে হবে ১ শ হাত দূরে। আমরা যত জ্ঞান অর্জন করব, আমাদের মর্যাদা যত বাড়বে, এসব ব্যাপারে নিজের সাথেই নিজেকে হতে হবে তত কড়া। অপার সুখ অর্জন সম্ভব শুধু এভাবেই। নিজের মাঝে এমনসব গুণের সমাহার থাকলে, এমন এক ঠিকুজির খোঁজ পাবো আমরা, অন্যরা তখন ঈর্ষা করবে আমাদের।

বাক্‌র বিন আবদুল্লাহ মুজানি / বলেছেন, “এক লোক বলেছেন,, আমার বাবা একবার [হাজ্জের সময়] আরাফার পাহাড়ে উঠে খুব নরম সুরে বলেছেন, ‘আমি এই জমায়েতের কেউ না হলে বলতাম, তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।’”

ইমাম জাহাবি এই কথার উপর মন্তব্য করেছেন, “আল্লাহ খাঁটি দাসদের বিনয় তো এমনই হওয়া চাই। নিজের দেমাগকে এভাবেই তার গিলে ফেলা দরকার।” [০১১]

অল্পে তুষ্টি, সংযম

নিজের মধ্যে সন্তুষ্টি আর সংযমের গুণ থাকতে হবে। কিছু কিছু কাজ আছে হালাল ও হারামের মধ্যবর্তী। নিজেকে ওগুলো থেকে দূরে রাখার নাম সংযম। এতে করে হারাম থেকে নিরাপদ থাকা সহজ হবে। অন্যের জিনিসের প্রতি লোভ জন্মাবে না। [০১২]

ইমাম শাফিই / বলেছেন, “কোনো বিজ্ঞ লোক যদি কাউকে সত্যি আন্তরিক কোনো উপদেশ দেন, তিনি তবে তাকে সংযমী হবার উপদেশ দেবেন।” [০১৩]

একবার মুহাম্মাদ বিন হাসান শাইবানির কাছে জানতে চাওয়া হল তিনি কি সংযম বিষয়ে কোনো বই লিখবেন নাকি। তিনি বললেন, “আমি তো এরই মধ্যে ব্যবসায়ের লেনদেনের বিষয়ে বই লিখেছি।” [০১৪] ইমাম জারনুজি এ-কথার উপর মন্তব্য করেছেন, “যে-লোক ব্যবসা কিংবা অন্য যেকোনো লেনদেন ও পেশাতে হালাল-হারামের মধ্যবর্তী অস্পষ্ট জিনিস থেকে দূরে থাকেন, তিনিই তো সত্যিকার সংযমী।”

একজন জ্ঞানযাত্রী জীবনযাপনের ধারা হবে সম্মানজনক, কিন্তু বাহুল্যবর্জিত। কোনো ধরনের অপমান বা লজ্জায় যেন পড়তে না হয়, সেজন্য নিজের ও পরিবারের জন্য ন্যূনতম আয়রোজগার তাকে নিশ্চিত করতে হবে।

আমাদের শাইখ মুহাম্মাদ আমিন শিংকিতি / খুব সাধারণ জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন। তাকে দেখতাম কখনও কখনও তিনি একাধিক টাকার নোটের মধ্যে পার্থক্য করতে পারছেন না! তিনি আমাকে একবার বললেন, “আমার দেশ থেকে খুব দামি এক জহরত আমি নিয়ে এসেছি। এটা

জ্ঞানযাত্রার চোরাফাঁদ
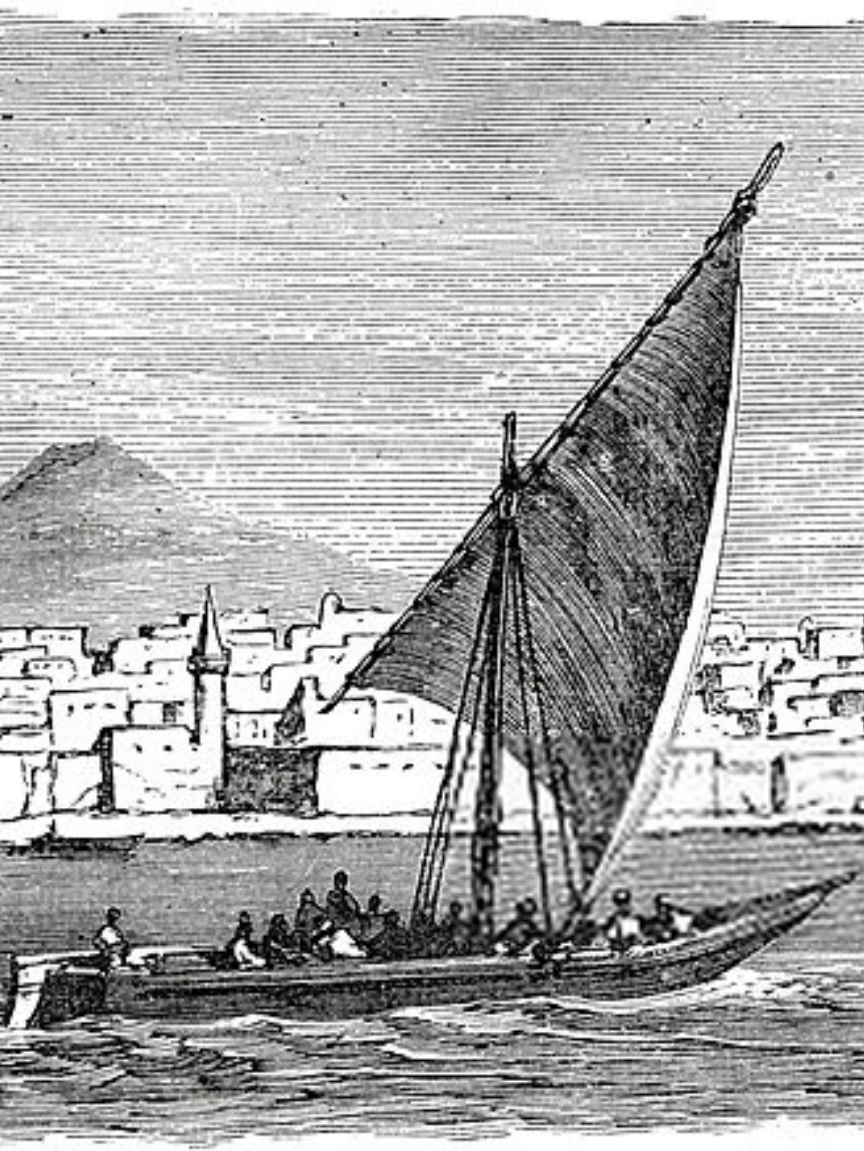
নয়, আমাদের এটা মাথায় রাখতে হবে। সৎ ও ধার্মিক যে-মুসলিম নিয়মিত সালাত পড়েন, তাকে সালাতের বাকি সব সুন্না জানানো জরুরি বটে; শুধু মৌলিক ফরজগুলো তার জন্য যথেষ্ট নয়।

কিন্তু যে-মানুষটির মনমগজে ইসলাম ছাইচাপা হয়ে পড়ে আছে, পাপের চাপে যে ভালোর দিশা পাচ্ছে না, তার জন্য একই দাওয়া-পদ্ধতি ঠিক না। ওখান থেকে তাদের উদ্ধার করে ইসলামের মৌলিক ভিত্তির দিকে তাদের ডাকতে হবে আগে। আমাদের প্রাধান্য পাবার প্রথম দাবিদার তারা। আল্লাহর ইচ্ছায় নিয়মিত সালাত আদায়কারী কেউ নির্দিষ্ট কোনো সুন্না ছেড়ে দিলে অকূল পাথারে পড়ে যাবেন না। কিন্তু যে ব্যক্তি পাপের সাগরে ডুবে আছে এবং ভুলভাল বিশ্বাস নিয়ে চলছে সে অবশ্যই মহা বিপদের মধ্যে আছে। তাই একজন ধার্মিক ব্যক্তিকে একটি সুন্না শেখানোর চেয়ে এ ধরনের পাপাচারি ব্যক্তিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানো অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

কুরআন-সুন্নার ভাসাভাসা অধ্যয়ন

কুরআন-সুন্না অধ্যয়নের জন্য প্রয়োজন মেধা, সততা, অভিজ্ঞতা। আর সর্বোপরি ইসলামিক আইনশাস্ত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা। এর জন্য প্রয়োজন আরবি ভাষা এবং এর অনন্য প্রকাশভঙ্গী সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান।

কোনো কোনো ছাত্রের এসব গুণের কোনোটিই নেই। ইসলামি আইন সম্পর্কে বিস্তারিত জানার আগ্রহ নেই। শারিআতের অনিশ্চিত ও একাধিক সম্ভাব্যতার ক্ষেত্রগুলো তারা বোঝে না। সঠিক উৎস থেকে ইসলামি বিধান বের করে আনার মতো গভীর অন্তর্দৃষ্টিও তাদের থাকে না। তারা একটা বই হাতে নেবে, এরপর মনমতো ফাতওয়া দেওয়া শুরু করবে। এখানেই থামবে না; একগুঁয়েমির সাথে এই ফাতওয়াগুলো বাস্তবায়ন করতে থাকবে। যারা তাদের সাথে একমত হবে না অত্যন্ত অরুচিকর ভাষায় তাদেরকে তিরস্কার করবে।

এখানে দুটি সমস্যা দেখা যাচ্ছে।

- মূলপাঠের মাত্রাতিরিক্ত শাব্দিক অধ্যয়ন।
- একটি বিষয়ে অধ্যয়নের পর তা থেকে অতি দ্রুত সিদ্ধান্তে আসার প্রবণতা।

চলুন, এ সম্পর্কিত কিছু দৃষ্টান্ত দেখি:

শাব্দিক অধ্যয়ন

প্রথম দৃষ্টান্ত

নবি ﷺ বলেছেন

> «কারো মাঝে যদি ৪টি খাসলত দেখা যায় তবে সে একজন ভণ্ড। এ ৪টির যেকোনো একটি কারও মাঝে থাকলে তার মাঝে ভণ্ডামি রয়েছে। খাসলতগুলো না ছাড়া পর্যন্ত সে ভণ্ড। এগুলো হচ্ছে: গচ্ছিত সম্পদ আত্মসাৎ করে, কথা বললে মিথ্যে বলে, কথা দিয়ে কথা রাখে না। তর্কবিতর্কে খুব খারাপ আচরণ করে।»[০০২]

হাদিসের এই কথাগুলোকে কেউ কেউ হুবহু গ্রহণ করে। ভণ্ডামি সম্পর্কিত অন্যান্য যাবতীয় বর্ণনাকে উপেক্ষা করে। ফলস্বরূপ তারা বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়। একবার তো একজন এই হাদিসে বর্ণিত ভণ্ডামিকে 'কাফির' হিসেবে আখ্যা দিয়েছিল। বলেছিল, যে যে ব্যক্তি আত্মসাৎ করবে, ওয়াদা ভাঙবে, মিথ্যা বলবে এবং পারস্পরিক বাদানুবাদে গর্হিত আচরণ করবে সে কাফির! এমন কথা বলে সে আসলে কুরআন-সুন্নার শতশত বর্ণনা অস্বীকার করল। কারণ, আমরা জানি, শুধু একটি গুনার কারণে একজন বান্দা কাফির হয়ে যায় না। এটি ইসলামে বিশ্বাসের একটি মূলনীতি। ইমাম তাহাউই ইসলামি বিশ্বাস সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ এক আলোচনায় বলেন,

> “আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস রেখে, আল্লাহকে জেনে রেখে নবিজির যেসব অনুসারী গর্হিত অপরাধ করে তাওবা না করে মারা গেছে তারাও জাহান্নামের আগুনে চিরকাল থাকবে না”

মূলধারার মুসলমানদের সবাই এ ব্যাপারটিতে একমত। নির্দিষ্ট উৎসের ভাসাভাসা অধ্যয়ন ও অন্যান্য উৎসকে উপেক্ষা করার মধ্যে যে কী বিপদ তা বোঝা যাচ্ছে এই দৃষ্টান্ত থেকে।

দ্রুত সিদ্ধান্তে আসার ঝোঁক

এবার আমরা দেখব মূল উৎস ঘেঁটে সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো প্রবণতার সমস্যা। এখানে আমরা এমন কিছু বিষয়ে আলোচনা করব যা নিয়ে আলিমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। কোনো নির্দিষ্ট মতকে সমর্থন দেয়া এখানে আমাদের উদ্দেশ্য নয়; ইসলামি জ্ঞানের মৌলিক পবিত্র উৎসগুলো নিয়ে কাজ করার সময় নিয়মানুবর্তিতা এবং সতর্কতার প্রয়োজনীয়তা বোঝানো আসল উদ্দেশ্য।

প্রথম দৃষ্টান্ত

নবি ﷺ বলেছেন, «যার উজু নেই তার সালাত হবে না। উজু করার সময় আল্লাহর নাম না নিলে তা হবে না।» [০০৩]

অনেক আলিম এই হাদিসকে সহিহ হিসেবে সত্যায়ন করেছেন। কিছু আলিম এথেকে এ-সিদ্ধান্তে এসেছেন, উজুর আগে আল্লাহর নাম নিলেই কেবল উজু হবে। ইসহাক বিন রাহাউইয়া, ইমাম আহমাদের একটি মত এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হাদিস আলিমের মত এটি।

মতটির ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক নিয়ে আলোচনার কোনো ইচ্ছা আমার নেই। আমার উদ্দেশ্য একটা হাদিস বা কুরআনের আয়াত পড়ে যারা শশব্যস্ত হয়ে সিদ্ধান্তে চলে আসে, তাদের কর্মপন্থার ভুলটি দেখিয়ে দেয়া।

ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফিই-সহ অধিকাংশ আলিমদের মতে উজু করার পূর্বে আল্লাহর নাম নেয়া সুন্নাত মুআক্কাদা; আবশ্যিক নয়। এটি ইমাম আহমাদ এর অপর একটি মত এবং ইবনু তাইমিয়া-সহ পরবর্তী অনেক আলিমদের মত। সমসাময়িক অনেক ইসলামি আইনজ্ঞদের মতও এটা।

তার মানে কি এসব প্রখ্যাত আলিমগণ হাদিসটিকে দেয়ালে ছুড়ে মেরেছেন? কিছু শিক্ষার্থী যেমন এই হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে আলিমদের নামে কটাক্ষের সুরে কথা বলে, আমরাও কি সেভাবে বলব?

অল্প কিছু প্রাচীন আলিম হাদিসটিকে নির্ভরযোগ্য বলে বিশ্বাস করতেন না। তাদের কেউ কেউ একে সহিহ বলে মানলেও তাদের কিছু ভিন্ন ব্যাখ্যা ছিল। আল্লাহর নাম না নিলে উজু হবে না—হাদিসটিকে তারা এই অর্থে নেননি। তাদের মতে এই ধরনের উজু উত্তম উপায়ে করা হলো না। এবং তাদের মতের পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণও আছে।

সুনান আবু দাউদে বিশুদ্ধ বর্ণনাসূত্রে এক হাদিসে দেখি, এক বেদুইনকে উজু শেখানোর সময় নবিজি ﷺ আল্লাহর নাম নেয়ার কথা বলেননি।[০০৪]

সুতরাং, আমরা ধরে নিতে পারি, এটা সবসময় করা বাধ্যতামূলক নয়।

কমপক্ষে ২২ জন সাহাবি নবিজির উজু সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাদের কেউই আল্লাহর নাম নেয়ার ব্যাপারটি বলেননি।

তো, মোদ্দাকথা, একটা বিষয়ে কেউ যদি দুএকটি হাদিস আর আয়াত থেকে দ্রুত সিদ্ধান্তে আসে, অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়, সেটা ভুল। কিছু তাড়াহুড়োপ্রবণ শিক্ষানবিশদের কাছে বিষয়টা অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে।

একটি কথা আবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাচ্ছি। এসমস্ত কথা আমি একটি মতকে অন্য মতের উপর প্রতিষ্ঠার জন্যে বলছি না। এসমস্ত

মতামতের সাথে সহমত বা দ্বিমত করার পূর্ণ অধিকার আপনার আছে। কেউ এটা বলতেই পারে যে, উজু করার পূর্বে আল্লাহর নাম নেয়া বাধ্যতামূলক। এতে কোনো সমস্যা নেই। এ-সমস্ত বিষয়ের অবতারণা করার পেছনে আমার একমাত্র উদ্দেশ্য, জ্ঞানের উৎসগুলো নিয়ে নাড়াচাড়ার সময় অসংখ্য যুক্তি প্রমাণ এবং দৃষ্টিকোণ নিয়ে কাজ করতে যে কতটা জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রয়োজন তা দেখানো। আমাদের অতীত মনীষীগণ কত গভীর গবেষণা করতেন একটা বিষয়ে, সেটা দেখানোও একটা উদ্দেশ্য ছিল। একজন জ্ঞানযাত্রী নিজ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে কোনো একটি মতের অনুসারী হতে পারেন। তার কোনো ট্রেন ছুটে যাওয়ার ভয় নেই যে দ্রুত কিছু একটা মত দিতেই হবে তাকে।

নতুনত্বের আকাঙ্ক্ষা

যেকোনো কিছুতে নতুনত্ব মানুষকে উদ্দীপ্ত করে। যখন কেউ স্বাভাবিক এবং নীরস কিছু শোনে তখন সে স্বাভাবিকভাবেই কম গুরুত্ব দেয়। কিন্তু কোনো নতুন এবং অদ্ভুত জিনিস শোনার পর সে তাতে অখণ্ড মনোনিবেশ করে। একটি ব্যস্ত রাস্তার পাশে হেঁটে যাওয়া কোনো পথচারী নিরন্তর ছুটে চলা যানবাহনগুলো নিয়ে কখনওই এতটা মাথা ঘামায় না। কিন্তু যদি কোনো বিদঘুটে গাড়ি তার পাশ দিয়ে চলে যায় বা কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা যদি ঘটে, তবে অন্য দশজনের সাথে তাল মিলিয়ে সে-ও দেখতে চায়।

পড়াশোনা এবং জ্ঞান অন্বেষণেও এরকমটা হয়। প্রচুর ছাত্রকে দেখা যায়, তারা উদ্ভট কিছু বিষয়ে জ্ঞান রাখে। এমন সব বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করে যেগুলো অধিক বিভ্রান্তিময়।

নতুন এবং উদ্ভট কিছু বিষয়ে কিছু ছাত্রের মাঝে নিদারুণ আগ্রহ দেখা যায়। এরকম কোনো ছাত্র যদি এমন কোনো মতামত পায় যেটি গতানুগতিকের বাহিরে তবে সে এটি শক্তভাবে গ্রহণ করে এবং এর পক্ষে

প্রাথমিক কথা

তারিফ শুধু আল্লাহর জন্য।

আল্লাহ ভীরুদের মাঝে অগ্রগামী এবং শেষ নবি মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার, সাহাবি এবং কিয়ামাত পর্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠভাবে যারা তাদের অনুসরণ করবে, তাদের সবার উপর ঝরুক আল্লাহর শান্তি ও আশীর্বাদের ঝরনাধারা।

উপদেশ আর তিরস্কারের পার্থক্য নিয়ে অল্প কথায় সামগ্রিক ধারণা দেবে এমন কিছু কথা বলব এখানে। দুটো বিষয় একটি আরেকটির সম্পূর্ণ বিপরীত। তবে দুক্ষেত্রেই মানুষকে অপছন্দনীয় কথা শুনতে হয়। এজন্য বেশিরভাগ লোক এ দুয়ের পার্থক্য বোঝে না। সে যাহোক, সঠিক বুঝ দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ। (সবাইকে তিনি সঠিক বুঝ দান করুন।)

একটু মন দিয়ে শুনুন: নিজের সম্বন্ধে যে কথাটা শুনতে কেউ ঘৃণা করবে সেটা বলা হারাম। কখন?

যখন এর পেছনে মতলব হবে তার সমালোচনা, এবং তার ভুল আর ঘাটতিগুলো ছড়িয়ে দেয়া।

তবে ভুল কিবা ঘাটতিগুলো জানালে যদি সাধারণ মুসলিমদের কল্যাণের সম্ভাবনা থাকে—অন্তত কিছু মুসলিমের জন্য হলেও—এবং এর পেছনে একমাত্র উদ্দেশ্য যদি হয় কল্যাণকামিতা, তা হলে এটা নিষিদ্ধ নয়; বরং তখন এ কাজে উৎসাহ দেয়া হয়েছে।

হাদিসশাস্ত্রের জার্‌হ তাদিল বিষয়ের আলোচনায় হাদিসবিদগণ এ মূলনীতির ব্যাপারে এক। তারা বলেছেন, কোনো হাদিস বর্ণনাকারীর সমালোচনা করা এক জিনিস; আর তার তিরস্কার করা আরেক জিনিস। এদুটোকে যার এক মনে করেন, হাদিসবেত্তাগণ তাদেরকে খণ্ডন করেছেন।

দু ধরনের মানুষ এ দুটোকে এক করে দেখেন: সারাক্ষণ যারা নিজেদেরকে বিভিন্ন ইবাদাতে মশগুল রাখেন (যে কারণে মানুষ তাদের বাহ্যিক আচার আচরণ দেখে ভাবে তারা বোধ হয় খুব জ্ঞানী মানুষ), এবং যাদের জ্ঞান যথেষ্ট নয়।

সমালোচনা কখন অনুমোদিত? হাদিস বর্ণনাকারীদের থেকে কার বর্ণনা নেয়া যাবে আর কার বর্ণনা নেয়া যাবে না—এক্ষেত্রে সমালোচনার অনুমোদন আছে। আবার কেউ যদি কুরআন-সুন্নার অর্থ ভুলভাবে বোঝে, ভুল কিছু অনুসরণ করে তার সমালোচনাও বৈধ। উভয় ক্ষেত্রে এই সমালোচনার উদ্দেশ্য ওই ভুল বিষয়ে যেন কেউ তার অনুসরণ না করেন। আলিমগণ সর্বসম্মতভাবে এই সংশোধনের বৈধতার ব্যাপারে একমত। তাফসীর, শার্‌হ্‌, ফিক্‌হ্‌, আলিমদের মাঝে ভিন্নমত-সহ ইসলামের নানা শাস্ত্রীয় বিষয়ে তারা যেসব বই লিখেছেন সেগুলো তাই বিপরীত যুক্তিপ্রমাণ আর খণ্ডনে পূর্ণ। সাহাবি, তাবি থেকে শুরু করে অনুজ এবং অধুনা আলিমদের দুর্বল মত নিয়ে তাদের এত সব পরিশ্রম।

জ্ঞানী ব্যক্তিরা কখনও সংশোধনের কাজটা থেকে নিরত হননি। কিন্তু তাই বলে কাউকে খণ্ডন বা ভুল প্রমাণ করতে গিয়ে তাকে অবজ্ঞা, সমালোচনা বা মানহানি করার মনোভাব নিয়ে এগোননি। তবে যাকে খণ্ডন করছেন তার কথাবার্তায় যদি নীতিবর্জিত ও জঘন্য কিছু থাকে সেক্ষেত্রে তারা ব্যতিক্রম ছিলেন। কিন্তু তারপরও এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তির নীতিবর্জিত ও অরুচিকর কথাকে একপাশে ফেলে রেখে তারা খণ্ডন ও বিরোধিতা করতেন। আর সবই হতো স্পষ্ট প্রমাণ ও সুযুক্তির নিরিখে।

তাদের এসব কাজ করার পেছনে উদ্দেশ্যও ছিল মহৎ। কুরআন-সুন্নার সঠিক জ্ঞান সবার কাছে স্পষ্ট করা, মানুষের পুরো জীবন যাপনের পদ্ধতিকে আল্লাহমুখী করা, সবকিছুর উপর তাঁর কথামালাকে তুলে ধরার অভিন্ন অভিলাষ ছিল তাদের।

আমাদের আলিমেরা মানতেন, জ্ঞানের কোনো না কোনো অংশ অবশ্যই তাদের অগোচরে পড়ে থাকবে। কারও পক্ষেই জ্ঞানের সুবিশাল সাগর পাড়ি দেয়া সম্ভব না। অতীত বা বর্তমানের কোনো আলিম কখনও দাবি করেননি, তিনি সব জানেন। আমাদের পূর্বসুরি বিদ্বানদের মাঝে যারা অত্যন্ত প্রখর জ্ঞান ও মেধার অধিকারী ছিলেন, যাদের যোগ্যতা নিয়ে কারও মনে বিন্দু পরিমাণ সন্দেহ নেই, সেই তারাও কিন্তু নিজেদের সামনে সত্য প্রকাশ পেলে নির্দ্বিধায় মেনে নিতেন। নিজের চেয়ে বয়সে কম কেউ যদি সঠিক জ্ঞান উপস্থাপন করতেন, তা মেনে নিতে কসুর করতেন না। নিজের পূর্বের মত থেকে সরে আসতেন। সঙ্গীসাথি অনুসারীদের বলতেন সঠিকটা মেনে নিতে। নিজের বলয়ের বাইরের কারও কাছ থেকে এসেছে বলে সত্যের সামনে গো ধরে থাকতেন না।

খলিফা উমারের সময়ে এমন একটি ঘটনা আছে। আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন। স্ত্রীদের মোহর কী পরিমাণ হবে সেটা নিয়ে তিনি একবার তার ফায়সালা দিচ্ছিলেন। এক নারী উঠে তখন কুরআনের একটা আয়াত তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। আয়াতটি ছিল:

> ﴿যদি তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের বদল করতে চাও, তাহলে তাকে বিপুল সোনাদান দিলেও তা ফিরিয়ে নেবে না।﴾ [৪:২০]

আয়াতটি স্মরণ হতেই খলিফা তার আগের কথা ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, "একজন নারী ঠিক বলেছেন, আর একজন পুরুষ ভুল বলেছে।" বলা হয় তিনি আরও বলেছেন, "উমারের চেয়ে ফিক্‌হি বিষয়ে বাকি সবার বুঝ বেশি।"

প্রথিতযশা আলিমদের মাঝে কেউ কেউ কোনো বিষয়ে নিজেদের ফায়সালা দেয়ার পর বলতেন, "আমরা শেষ পর্যন্ত এই মতে এসে স্থির হয়েছি। কেউ যদি এর চেয়ে ভালো কোনো ফায়সালা নিয়ে আসেন, আমরা তা হলে সেটা মেনে নেব।"

ইমাম শাফিই অত্যন্ত কঠোরভাবে এই মূলনীতি মেনে চলতেন। তার ফায়সালার বিপরীতে কোনো সত্য থাকলে, সুন্না থাকলে তার সঙ্গীরা যেন সেটা অনুসরণ করে, মেনে নেয় এবং তার মতকে দেয়ালে ছুঁড়ে ফেলে সে উপদেশ দিয়ে তিনি বলতেন, "আমার মতের মধ্যে অনেক কিছুই কুরআন-সুন্নার সঙ্গে সাংঘর্ষিক পাবে। কারণ, সুমহান আল্লাহ বলেছেন,

> ﴾কুরআন যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছ থেকে আসত, তা হলে তোমরা এতে অবশ্যই অসংখ্য অসামঞ্জস্যতা খুঁজে পেতে।﴿ [৪:৮২]

"যত যার সাথে আমার বিতর্ক হয়েছে, আমি দেখেছি, সত্য হয় তার মুখ থেকে বের হয়েছে, নয় আমার মুখ থেকে।"—কথার কী গভীরতা!

ভিন্নমত থেকেই হোক, আর বিতর্ক থেকেই হোক, সত্যটা ফুটে উঠুক—এটাই ছিল তার একমাত্র চাওয়া।

যারা এ ধরনের মনোভাব বুকের মাঝে আগলে রাখেন, কেউ তার কোনো মত ছুঁড়ে ফেলে দিলে সেটা তার কখনও অপছন্দ হবে না। তার জীবিত অবস্থায় বা মৃত্যুর পরও যদি কেউ তার কোনো সুন্নাবিরোধী মত শুধরে দেয়, তবু সেটা তার খারাপ লাগবে না।

অতীত কিংবা বর্তামানের যেসব আলিম ইসলামের জ্ঞান সংরক্ষণ করেন, ইসলামের প্রয়োজনে উঠে দাঁড়ান, তাদের সবার মনোভাব ছিল এমন। তাদের মতের বিরুদ্ধে কেউ প্রমাণ-নির্ভর কথা বললে তাকে তারা অপছন্দ করতেন না। শুধু তাই না। ভিন্নমতটা যদি তাদের দৃষ্টিতে যথেষ্ট শক্তিশালী না-ও হতো, তবু কিন্তু তাদের ব্যাপারে নিজ নিজ মনোভাবের কোনো হেরফের হতো না।

ইসহাক বিন রাহাওয়াইর অত্যন্ত তারিফ করতেন ইমাম আহমাদ। একবার তার প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, "যেখানে তার সঙ্গেই আমার কিছু মত মেলে না, সেখানে অন্যদের দ্বিমত করা তো খুব স্বাভাবিক ব্যাপার।

বা অনেকটা এমনই কিছু বলেছিলেন তিনি। আল্লাহ তাদের দুজনের উপর দয়া করুন।

কখনও কখনও ইসহাক ও অন্যান্য ইমামদের মত হাজির করা হতো তার সামনে। সেগুলোর তথ্যসূত্রও থাকত। দেখা যেত, তিনি সেগুলোর সঙ্গে একমতও হচ্ছেন না, আবার বাতিলও করে দিচ্ছেন না।

হাতিম আসামের একটা ঘটনা বলেছেন ইমাম আহমাদ। কেউ একজন তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আপনি তো অনারব। আবার কথাবার্তাতেও পটু নন। কিন্তু আপনার সাথে যে-ই বিতর্ক করে তাকেই থামিয়ে দেন। কীভাবে জেতেন বলুন তো?"

তিনি বললেন, "তিনটি জিনিস দিয়ে: কোনো বিষয়ে কেউ সঠিক কথা বললে আমি খুশি হই। সে ভুল করলে আমি কষ্ট পাই। আমি তখন সাথে সাথে চুপ হয়ে যাই, যাতে আমার মুখ দিয়ে এমন কোনো কথা না বের হয়, যেটা তাকে কষ্ট দেয়।"—বা এরকম অর্থবোধকই কিছু বলেছিলেন।

ঘটনাটি বলার পর ইমাম আহমাদ বলেছিলেন, "কী জ্ঞানী মানুষ ছিলেন তিনি!"

তো উপযুক্ত প্রমাণের ভিত্তিতে দুর্বল মতকে ভুল প্রমাণ এবং তার বিপরীতে সত্যটাকে স্পষ্ট করাকে কোনো আলিম কুনজরে দেখেননি; তারা বরং এটা পছন্দ করতেন। এবং যারা এ ধরনের কাজ করতেন তাদের তারিফ করতেন।

এ বিষয়টা কোনোভাবেই পরনিন্দার মাঝে পড়ে না।

কেউ তার সুন্নাবিরোধী কোনো ভুল উন্মোচন হওয়াকে যদি অপছন্দ করে, তা হলে তার সে অপছন্দকে আমলে নেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। নিজের ভুলের বিরুদ্ধে সত্য উদ্ভাসিত হওয়াকে ঘৃণা করাটা কোনো প্রশংসার বিষয় নয়। নিজের মতের সঙ্গে মিলুক কি না মিলুক, সত্য প্রকাশ

এবং মুসলিমদের তা জানিয়ে দেয়ার বিষয়টিকে কোনো মুসলিম অপছন্দ করতে পারবে না।

অতীতে ভুলকারী কোনো আলিমের কোনো ভুল যদি কেউ কেউ সুন্দর আচরণ বজায় রেখে সুন্দরভাবে খণ্ডন ও প্রতিবিধান করেন, তা হলে কোনো সমস্যা নেই। এজন্য তাকে দোষ দেয়া যাবে না। কেউ যদি ভুলকারী আলিমের অনুসরণে কোনো ভুল করে থাকেন, সে দায় অনুসরণকারীর নয়।

পূর্বসূরি বিদ্বানগণ কারও মত প্রত্যাখ্যান করলে বলতেন, ‘তিনি সত্য বলেননি।’ কথাটি তারা নবিজির একটি বচন থেকে ধার নিয়েছেন। একবার তাঁর কাছে খবর পৌঁছাল, তিনি নাকি ফায়সালা দিয়েছেন, বিধবা নারীর সন্তান হবার পর সাথে সাথে সে পুনরায় বিয়ে করতে পারবে না; ৪ মাস ১০ দিন অপেক্ষা করতে হবে। এ দাবির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেছিলেন, “আবুস-সানাবীল সত্য বলেনি।”[০০১]

ন্যায়পর ইমামগণ আলিমদের দুর্বল মত ছেড়ে দিতে চেষ্টা করতেন সাধ্যমতো। খণ্ডন করলে সর্বোচ্চ নীতি বজায় রেখে তা করতেন। আবু সাওর ও অন্যান্যদের যেসব মত শুধু তাদের একজনের কাছ থেকেই পাওয়া যেত ইমাম আহমাদ সেগুলোর সমালোচনা করতেন। এবং খুব ভালোভাবেই করতেন সে কাজটা।

এ তো গেল বাহ্যিক ও দৃষ্টিগোচর ব্যাপারগুলো। অন্তরের বিষয়ও আছে।

কারও সমালোচনায় যদি কারও উদ্দেশ্য হয় সত্যকে স্পষ্ট করা এবং ভুল মত প্রদানকারীর কথায় কেউ যেন ধোঁকা না-খায় সেই ইচ্ছা, তা হলে নিসন্দেহে তিনি তার নিয়্যাতের কারণে পুরস্কৃত হবেন। যারা আল্লাহ, তাঁর গ্রন্থ, তাঁর রাসুল, তাঁর ধর্ম, মুসলিমদের নেতা ও সাধারণ জনতার প্রতি আন্তরিকতা দেখান, এমন নিয়তকারী হবেন তাদের একজন। এ ধরনের খণ্ডনের কিছু নমুনা পাবেন ইবনু আব্বাসের মুতআ (সাময়িক বিয়ে),

সার্‌ফ (অদলবদল), 'উমরাতাইনসহ কিছু কিছু মতের বেলায় আলিমগণ যে-খণ্ডন করেছেন সেখানে।

এ ধরনের আরও কিছু ভালো উদাহরণ পাবেন সাঈদ ইবনুল-মুসায়্যিবের দুর্বল কিছু মতের ভুল প্রমাণে। তার এরকম একটা মত ছিল যে, তিনবার তালাকপ্রাপ্ত কোনো নারী অন্য একজনের সঙ্গে দৈহিক-মিলন ছাড়া কেবল বৈবাহিক চুক্তিতে আবদ্ধ হলেই তিনি আবার তার প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবেন। প্রমাণিত সুন্নার সঙ্গে বিরোধী এমন আরও কিছু মত ছিল তার। হাসান বাসরির একটা মত ছিল, কোনো স্ত্রী তার মৃত স্বামীর জন্য শোক করতে পারবেন না। সম্মানিত ও অভিজ্ঞ আলিমগণ এ ধরনের মত খণ্ডন করেছেন। তারা আতার দুর্বল মত খণ্ডন করেছেন। আলিমদের সঙ্গে তাউসের ভিন্নমতগুলো খণ্ডন করেছেন। যেসব আলিমের জ্ঞান, সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপারে কারও মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই, তাদেরও কোনো কোনো ভিন্নমত খণ্ডিত হয়েছে। কিন্তু একজন আলিমও মনে করেননি, এ ধরনের এবং অন্য যেসব ইস্যুতে যারা তাদের সাথে একমত হননি, তারা সেসব ইমামের মর্যাদাহানি বা মানহানি করছেন।

শাফিই, ইসহাক, আবু উবাইদ, আবু সাওর-সহ হাদিস ও ফিক্‌হ শাস্ত্রের অতীত-বর্তমানের মুসলিম জ্ঞানীদের বইগুলো এসব মতের ব্যাখ্যায় পূর্ণ। এখানে এসব উল্লেখ করতে গেলে আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাবে।

কাউকে খণ্ডনের উদ্দেশ্য যদি হয় তার ভুল উন্মোচন করা, তার মানহানি করা, তার অজ্ঞতা ও জ্ঞানের ঘাটতি দেখিয়ে দেয়া তাহলে সেটা নিষিদ্ধ। তার উপস্থিতিতে, অনুপস্থিতিতে, তার জীবিত অবস্থায় বা মৃত্যুর পর—কোনো অবস্থাতেই এমন কাজ বৈধ নয়। মহান আল্লাহ্ কুরআনে এ ধরনের কাজের নিন্দা করেছেন। যারা এহেন অপকর্ম করে তাদেরকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। নবিজিও তাদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন:

> মুখে যারা বিশ্বাসের কথা বলো, কিন্তু অন্তরে করো না, তারা (শোনো): মুসলিমদের গালাগালি করবে না। তাদের খুঁত খুজে বেড়াবে না। যে তাদের খুঁত খুঁজবে আল্লাহ তার খুঁত খুঁজে বের করবেন। আর আল্লাহ যখন তার খুঁত উন্মোচন করবেন তখন সে নিজের ঘরে একাকী করলেও তার সেই খুঁত ফাঁস করে দেবেন।[০০২]

আমাদের এসব কথা ইসলাম অনুসারীদের জন্য।

কিন্তু যারা স্পষ্ট বিদআতি ও বিভ্রান্ত, যারা মুখে বলে আলিমদের অনুসরণ করে, কিন্তু আসলে করে না, তাদের ব্যাপারে হুঁশিয়ার করা, তাদের অজ্ঞতা আর ভুলত্রুটি দেখিয়ে দেয়া অনুমোদিত।

অনলাইনে বিতর্ক

ইন্টারনেট আজ কল্পনাতীতভাবে বাড়িয়েছে আমাদের কথা বলার সুযোগ। কিবোর্ড চেপে আজ আমরা শুধু অতীতের মানুষদের লেখনী সম্বন্ধেই নয়; কথা বলতে পারি আটলান্টিকের ওপারে অবস্থিত মানুষগুলো মাত্রই যা লিখলেন, তা নিয়ে। মুহূর্তেই আজ এমন গোষ্ঠী আমরা গড়ে তুলতে পারি, যারা পৃথিবী বদলের ক্ষমতা রাখেন। অনলাইনে আজ নিজেদের কোনো মত জানানোর সাথে সাথে আমরা সমর্থন পাই, সমালোচনার শিকার হই। কোনো লিংক দিয়ে আজ আমরা পাঠকদের এমন এমন সব উৎসের খোঁজ দিই, যা হয়তো তাদের পক্ষে জানা সম্ভব হতো না নইলে; কিংবা হয়তো কখনও এ-আলাপে তারা যোগ দিতে পারত না কখনো।

কীসের বিপরীতে লিখছেন তা শনাক্ত করুন

অনলাইন আলাপে বেশিরভাগ সময় বোঝা যায় না, যিনি প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন, তাকে কোন বিষয়টি বা কে উদ্বুদ্ধ করেছে লিখতে। যেকারণে দেখা যায়, বেশিরভাগ অনলাইন প্রতিক্রিয়াগুলো সত্যিকার অর্থে আলাপনের রূপ নেয় না। হয়ে ওঠে একের পর এক বিবৃতি—একটার সাথে আরেকটা কোনো সম্বন্ধ নেই। বোঝা যায় না, আরেকজন যা বলেছেন, লেখক কি সেটাকে আরও বিস্তৃত করছেন, ওটাকে চ্যালেঞ্জ করছেন, নাকি আলোচনার বিষয় বদলাতে চাচ্ছেন। ডিজিটাল দুনিয়া আমাদের অনেক দ্রুত অনেকের সাথে সংযুক্ত করছে বটে, কিন্তু নানা মুণির সাথে সত্যিকার আলাপনে বসা হয়ে উঠছে না।

অনলাইন আলাপে আমাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যেই দেখেছি এ-ব্যাপারগুলো। যেসব শিক্ষার্থী "তারা বলেন/আমি বলি" রূপকাঠামোটি নিয়মিত এবং কার্যকরভাবে ব্যবহার করে নানা নিবন্ধে, সেই তারাও

অনলাইন আলাপে দিব্যি ভুলে বসে এগুলো। ওখানে তারা বেশ উৎসাহ নিয়ে আলাপনে বসলেও, তাদের পুরো আলোচনা জুড়ে থাকে "আমি বলি"। "তারা বলেন"-এর বিষয়টা প্রায় থাকে না বললেই চলে। যেকারণে দেখা যায়, একে অন্যের সাথে আলাপের বদলে তারা শুধু নিজের কথাই বলে যাচ্ছে।

আমাদের ধারণা, এখানে যা হয় আসলে, ইন্টারনেটের কারণে কথাবার্তা প্রকাশের যে-সহজতা তৈরি হয়েছে, তাতে ধীরস্থির ভাবনা, সার-সংক্ষেপ করা কিংবা অন্যজন আসলে কী বলেছেন সেটা উপলব্ধি করাকে অপ্রয়োজনীয় বিবেচনা করা হয়। মন্তব্যকারীরা মনে করেন, স্ক্রল করে কিংবা লিংকে ক্লিক করে পাঠকেরা যেখানে সহজেই দেখতে পান কীসের বিপরীতে আমার প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছি, সেখানে সেগুলো আবার আমার মন্তব্যে উল্লেখের দরকার কী?

এরকম চিন্তার সমস্যা হলো, আপনি যে-মন্তব্যের বিপরীতে প্রতিক্রিয়া লিখছেন, বেশিরভাগ সময়ে পাঠকদের সেই সময় থাকে না সেগুলো পড়ে দেখার। তাছাড়া তাদের তো আগে বুঝতে হবে, কোন মন্তব্যের বিপরীতে আপনি এ-কথাগুলো বলছেন। পাঠকেরা যদি সেই মন্তব্যগুলো পড়ার শ্রম খরচ করেনও, আপনি এভাবে বললে তারা বুঝতে না-ও পারেন, সেই মন্তব্যের ঠিক কোন অংশ বা কোন দিকটির বিপরীতে বলছেন আপনি। পাঠক তখন একটা ধাঁধার মধ্যে থাকেন। যেন সে ফোনালাপের এক প্রান্তের কথা শুনে বোঝার চেষ্টা করছেন অপর প্রান্তে কী বলা হচ্ছে।

হ্যাঁ, কখনও কখনও অনলাইন আলাপে অন্যের মতের সার-সংক্ষেপ বা সূত্র টেনে আনা অনাবশ্যক। যেমন, আপনার কোনো বন্ধু যদি লেখেন, "থিয়েটারের সামনে ৭টায় থাকিস?" তখন "ঠিক আছে" বলাই যথেষ্ট। সেখানে যদি লেখেন, "থিয়েটারের সামনে ৭টায় থাকা সম্বন্ধে তোর পরামর্শের ব্যাপারে আমার উত্তর হলো হ্যাঁ"—তা যে শুধু বাহুল্যই হবে

কলাকুশলী

লেখক
বাক্‌র আবু জাইদ
সালমান আওদা
ইবনু রাজাব হানবালি

ভাষান্তর
মাসুদ শরীফ (১, ৩, ৪)
শেখ আসিফ (২)

সম্পাদনা
মাসুদ শরীফ

পৃষ্ঠা ও মলাটসজ্জা
মাসুদ শরীফ

মুদ্রণ সহযোগিতা
নুসরাহ প্রিন্টিং সলিউশনস

কৃতজ্ঞতা
আহমেদ ইয়াসীন (সমকালীন প্রকাশন)
আনাস আবু মুহাম্মাদ (সিজদা.কম)
নাবিল হাসান
কবির আনোয়ার
ডানকান১৮৯০ (স্টক ছবি)
মডুলার ইনফোটেক
ইন্ডিয়ান টাইপ ফাউনড্রি

বিশেষ কৃতজ্ঞতা
মো. নুরুল ইসলাম
তাহমিনা হোসেন